নারী ও মানবাধিকার

রীনা পাল

বিশ্ব মানবতার দরবারে সরব প্রতিবাদ নিয়ে উপস্থিত বিশ্বজনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ নারী সমাজ। যাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে নানা বিভঙ্গে, নানা প্রকরণে। জনসংখ্যার নিরিখে নারীরাই সমাজে নিপীড়িত অংশের মধ্যে সবথেকে সঙ্কটাপূর্ণ অবস্থানে আজ স্থিত। লিঙ্গ প্রভূত্বের বিরুদ্ধে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার কঠিন সংগ্রামে রত আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নারী আন্দোলন। শ্রেণী প্রভূত্বকারী প্রতিনিধিদের হাতে মূলত লাঞ্ছিত হচ্ছে নারীর আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অধিকার সহ জীবনের অধিকার।

শ্রেণী সংগ্রামের যুগারম্ভ থেকেই বৈষম্যবীজ নিহিত ছিল এই সমাজব্যবস্থার মধ্যে। একদিকে শ্রেণী বৈষম্য অপরদিকে নারী পুরুষের বৈষম্য এই দুটি ছিল শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অন্যতম দুটি মূল ভিত। নারীর অধিকারহীনতা বা দাসত্ব শুরু হয় পরিবার ও সম্পত্তির উদ্ভাবনের ফলে। বহু যুগ ধরে নারী সমাজকে পারিবারিক ও সামাজিক দাসত্বের বোঝা বহন করতে হয়েছে বিনা প্রতিবাদে। সভ্যতার ক্রম বিকাশের সাথে সাথে নিপীড়ন ও নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে – দাস সমাজব্যবস্থা এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা পুরুষ ও পরিবারের অধীনতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। সামাজিক উৎপাদনের কাজে নারীদের বঞ্চিত রেখেই তাদের পরাধীন জীবন যাপনের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

নারীর অধিকারহীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূচনা হয় ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে। নতুন করে নারীদের সামাজিক উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পারিবারিক সামাজিক নিষেধের গণ্ডী উপেক্ষা করে নারী সমাজকে বৃহত্তর জগতে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। যদিও নারীদের শ্রমের বাজারে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য ছিল সস্তা শ্রম। এ সত্ত্বেও পরিবারের দাসত্ব থেকে অনেক নারীই নিজেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন নারী পুরুষের উন্নততর সম্পর্কের সূচনা করেছিল।

ধনতন্ত্রের ঊষালগ্নে বুর্জোয়া শ্রেণীর একাংশ মানবিকতা এবং অধিকারের যে দাবী উত্থাপিত করে তাতে নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াও সূচিত হয়। নারীদের অধিকার অর্জনের দাবীতে ১৬৬২ সালে মার্গারেট লুকাস নামে একজন ওলন্দাজ মহিলা 'ফিমেল ওরেশনস' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। নারীর পরাধীনতা ও অসম অধিকারের বিষয়ে প্রথম লিখিত তথ্য হিসাবে এটি স্বীকৃত। বিশ্বের নারী জাগরণের ইতিহাসে নারীর অধিকারের এই দলিলে শুধুমাত্র সামাজিক অবর্ণনীয় দুর্দশা বা বৈষম্যের কথাই উচ্চারিত হয়েছিল। কারণ

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে জনগণের অংশগ্রহণের কোন সুযোগ তখন ছিল না।

অষ্টাদশ শতকের একেবারে অন্তিমলগ্নে ইউরোপে নারীর অধিকার, নারীর স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচনায় ক্রমশ উঠে আসতে থাকে। এ বিষয়ে ফরাসী বিপ্লবের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৭৮৯ সালের অক্টোবর মাসেই নারীরা জাতীয় পরিষদ (National Assembly) এর কাছে আবেদন করে, "নারী পুরুষের সমান অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য, নারীদের শ্রম ও কাজের জন্য, তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মে নিয়োগের জন্য। কিন্তু ১৭৮৯ সালে 'সংবিধান সভা' যখন মানুষের অধিকার (Declartion of the Right of Men and Citizen) ঘোষণা করল, নারীদের মধ্যে যাদের জ্ঞান বুদ্ধি ছিল তারা বুঝল যে ওর মধ্যে নারীর অধিকারের কথা নেই। তাই মাদাম অলিম্বে ডিগিজো (Olymbe Degouges) দাবী করলেন, 'নারীদের ফাঁসিকাঠে উঠবার অধিকার যদি থাকে তবে মঞ্চে উঠবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে।' এই প্রতিবাদী নারী মাদাম ডিগিজোকে পরবর্তীকালে ফরাসী সরকার গিলেটিনে মৃত্যুদণ্ড দেয়। একইভাবে সম্রাট নেপোলিয়ন যখন ম্যাডাম কলডোর সেটকে বলেছিলেন, "নারীরা রাজনীতির সাথে যুক্ত হোক আমি তো মোটেই চাই না।" প্রত্যুত্তরে মাদাম বলেছিলেন, "সেনাপতি, আপনি ঠিক, কিন্তু যে দেশে নারীদের শিরোচ্ছেদ করার প্রথা প্রচলিত আছে, স্বাভাবিকভাবেই নারীরা এর কারণ জানতে চাইতে পারেন – এ জিজ্ঞাসার অধিকার তাদের আছে।" এই জিজ্ঞাসার সূত্র ধরেই নারীরা তাদের অধিকার বিস্তারের আন্দোলনে সামিল হয়েছে। সমাজ পরিবর্তনের পথে নিজেদের সংগ্রামকে ব্যাপ্ত করেছে। ফরাসী বিপ্লবের পর সম-স্বাধীনতা প্রত্যাশী নারীসমাজ ১৭৯১ খ্রীঃ Declaration of the Right of Women and Citizen সনদটি প্রকাশ করে। এর মধ্য দিয়েই সমাজে তাদের সম অবস্থানের অভীপ্সা এবং আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই বিকল্প সনদটি পেশ করতে হয়েছিল তার কারণ ১৭৮৯ সালের Declaration of Rights of Men and Citizen এ নারীদের অধিকার কার্য্যতঃ স্বীকৃত হয়নি। আর এই দাবি তোলার ফলে মাদাম ডিগিজো, এলাপাম প্রমুখ নারীকে অকথ্য অত্যাচার ও মৃত্যুর শিকার হতে হয়েছিল।

১৭৯২ সালে ব্রিটেনের মেয়ে মেরী ওলস্টোনক্রাফট মেয়েদের অধিকারের সমর্থনে একটি বই লেখেন – যার নাম A Vindication of the Rights of Women। মেরি নারীশিক্ষার বিষয়ে সোচ্চার হলেন। একই সঙ্গে মেয়েদের গণতান্ত্রিক অধিকারের কথাও বললেন। ইংল্যান্ডের চার্টিস্ট আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণী তাদের দাবি নিয়ে সংগ্রাম করলেও নেতৃত্ব মূলতঃ থেকে যায় পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে। তার ফলে নারী-শ্রমিকদের মজুরী, কাজের ঘন্টা স্থায়ীকরণ, কর্মসংকোচন রদ প্রভৃতি বিষয়গুলি উপেক্ষিতই থেকে যায়। ১৮৫১ সালে হ্যারিয়েট টেইলর মিল (Harriet Taylor Mill) লিখলেন On the Enfracisement of Women.এতে তিনি নারী

শিক্ষা উন্নয়নের প্রস্তাব করেন এবং নারী সমাজকে অধস্তনে পরিণত করে এমন সব আইনগত ও রাজনৈতিক নিয়মকানুন পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন। ১৮৫৮ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্বামী জন স্টুয়ার্ট মিল The Subjection of Women (১৮৬৯) রচনা করেন, যাতে টেলরের মতাতম প্রতিফলিত হয়েছে। এতে মিল পুরুষের মতো নারীদেরকেও সকল অধিকার প্রদানের প্রস্তাব করেন।

উনিশ শতকের শেষের দিকে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে নারীর ভোটাধিকারের দাবী দানা বেঁধে ওঠে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পীঠস্থান ইংল্যান্ডে ভোটাধিকারের আন্দোলন সংগঠিত করেছিল যে সমস্ত নারী নেতৃত্ব তাদের কারারুদ্ধ করা হয় এবং অনশনরত অবস্থায় জোর করে অনশন ভাঙ্গার জন্য তাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয়। ইংল্যান্ডে নারীর ভোটাধিকারের আন্দোলন 'পেটিকোট রিবেলিয়ান' নামে খ্যাত। এর নেতৃত্বে ছিলেন প্যাংখার্স্ট ও তাঁর কন্যাদ্বয়। এই আন্দোলন করতে গিয়ে কারাগারে যেতে হয়েছে এঁদের ভোট দেবার প্রাথমিক গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনে ইংল্যান্ডের নারী সমাজকে বেশ কয়েক দশক সংগ্রাম করতে হয়েছে।

আমেরিকায় নারী আন্দোলন সংগঠিত হয় দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্র ধরেই। সেই সংগ্রামে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ মহিলারা একজোট হয়ে প্রতিবাদ করে। ১৮৩৩ এ এই মহিলাদের প্রথম প্রকাশ্য সভা বর্ণবিদ্বেষীদের আক্রমণে পণ্ড হয়। আমেরিকার দাসপ্রথা উচ্ছেদের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে তারা বুঝেছিলেন যে ক্রীতদাসরাই কেবল মালিকের দাস নয়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরাও পুরুষের দাসত্ব করে। সুতরাং দাস প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রকারান্তরে নারীদের মুক্তির সংগ্রাম ও নারীদের সমান অধিকারের সংগ্রাম। ১৭৭১ সালে এ্যাবিগেল এ্যাডাম নামে একজন মহিলা তাঁর স্বামী, আইন প্রণেতা জন এ্যাডামকে এক চিঠিতে জানান – "কোড অফ ল তৈরী হতে চলেছে। আমি আশা করি তাতে মেয়েদের কথা যেন স্মরণ থাকে এবং তোমরা মেয়েদের প্রতি তোমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে আরও উদার ও সহানুভূতিশীল হবে।যদি মেয়েদের প্রতি বিশেষ স্বাধীনতা ও নজর দেওয়া না হয় তাহলে বিদ্রোহী হতে বাধ্য হব। যেখানে আমাদের কণ্ঠস্বর নেই, আমাদের প্রতিনিধি নেই সেই আইন পালন করতে আমরা বাধ্য থাকব না।" ১৭৯০ সালে ম্যাসাচুসেট পত্রিকায় জুডথ্ সার্জেন্ট মারে কতকগুলি নিবন্ধ রচনা করে On the Equality of Sex এই নামে। এই গ্রন্থে তিনি সামাজিক ক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্যের কথা বিশ্লেষণ করেন এবং বলেন নারীরা জন্মগত কারণে পুরুষদের থেকে কম দক্ষ অথবা যোগ্য নয়। দুই আমেরিকান মহিলা লুক্রিসিয়া মোট এবং এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যানটন যৌথভাবে 'সেনেকা ফসল– ডিক্লেয়ারেশন অব সেন্টিমেন্টস' নামে একটি ইস্তাহার রচনা করেন (১৮৪৮) এই ঘোষণাপত্রে অন্যান্য দাবীর মধ্যে শিক্ষা ও সম্পত্তির অধিকার ও নারীদের ভোটাধিারের দাবী জানানো হয়।

সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে নারী অধিকারের প্রশ্নে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। মহিলা সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে ফ্লোরা ট্রিস্টান একটি উল্লেখযোগ্য নাম। নারী শ্রমিকদের দাবি দাওয়াকে আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরার নিরলস প্রয়াস চালিয়েছিলেন তিনি। মৃত্যুর আগে ট্রিস্টার্ন লিখেছিলেন– 'প্রায় গোটা বিশ্বই আমার বিপক্ষে। মালিকরা, কারণ আমি মজুরদের মুক্তি চেয়েছি। পুরুষেরা, কারণ আমি মেয়েদের মুক্তি চেয়েছি'।

দরিদ্র শ্রমজীবী মেয়েদের বিশেষত নারী শ্রমিকদের সমস্যার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ভাবনা চিন্তার মধ্যে এনেছিলেন জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেতারা। নারী শ্রমিকদের অধিকারের দাবিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বিশিষ্ট জার্মান সমাজতন্ত্রবাদী অগাস্ত বেবেল। জার্মান তন্তুবায় সমিতির অধিবেশনে বেবেল প্রস্তাব দেন যে কর্মক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী শ্রমিকরা সমান অধিকার ভোগ করবেন। ১৮৭১ সালে বেবেলের প্রস্তাব সমিতি গ্রহণ করে। একই বছর শ্রমজীবী আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত নেয় যে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মধ্যে নারী শ্রমিকদের স্বতন্ত্র শাখা খোলা যেতে পারে।

বেবেলের চিন্তাধারা অসামান্য প্রভাব ফেলে জার্মান সমাজতন্ত্রবাদের অগ্রগণ্যা নেত্রী ক্লারা জেটকিন এর চিন্তাধারায়। ক্লারার নেতৃত্বে জার্মানীর সমাজতন্ত্রী নারীরা মেয়েদের ইউনিয়নগুলিতে সান্ধ্য ক্লাসের ব্যবস্থা করলেন। নারী শ্রমিকদের কাজের শর্তের উন্নতি এবং রাজনৈতিক অধিকারের দাবী তুললেন। ১৮৯৫ সালে জার্মান সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টি মেয়েদের ভোটের দাবীকে সমর্থন জানালো। ১৯০১ সালে ক্লারার উদ্যোগে গঠিত হলো সোশ্যালিস্ট উইমেনস্ ইন্টারন্যাশানাল। তারা পৃথিবীজুড়ে সমস্ত সমাজতন্ত্রী দলকে প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের পুরুষের সমান সার্বিক ভোটাধিকার দেবার দাবী সমর্থন করতে বললো। ১৯১০ সালে কোপেনহেগেন সম্মেলনে সোশ্যালিস্ট উইমেন্স ইন্টারন্যাশনাল ভোটের সঙ্গে সমান মজুরী এবং প্রসূতিকালীন বীমার দাবী তুললো। সেই সঙ্গে ৮ই মার্চ দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানাল। কারণ ১৮৭১ সালে ফরাসি বিপ্লবে নারীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে ঐতিহাসিক প্যারী কমিউনের সৃষ্টি হয়েছিল ৮ ই মার্চ। ১৮৭৫ সালের ৮ ই মার্চ আমেরিকায় বস্ত্রশিল্পের নারী শ্রমিকরা ষোল ঘন্টার পরিবর্তে দশ ঘন্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট করেছিল। ১৯০৮ সালের ৮ ই মার্চ নিউইয়র্ক বস্ত্রশিল্পের নারী শ্রমিকরা কাজের সময় কমানো, মজুরি বৃদ্ধি, সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবিতে মিছিল করেছিল। লেলিনের নেতৃত্বে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে আন্তর্জাতিক নারীদিবসের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

পৃথিবীর নানা দেশে সমাজ সচেতন সংগ্রাম নারীদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ধীরে ধীরে নারীর অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৮৯৩ সালে নিউজিল্যান্ডে সর্বপ্রথম নারীর ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত

হয়। এরপর ১৯০২ সালে অস্ট্রেলিয়ায়, ১৯০৩ সালে নরওয়ে, ১৯০৬ সালে ফিন্‌ল্যান্ড, ১৯১৫ সালে ডেনমার্ক ও আইসল্যান্ড, ১৯১৭ সালে কানাডা, ১৯১৮ সালে অস্ট্রিয়া, ব্রিটেন, জর্জিয়া, হাঙ্গেরী, আয়ারল্যান্ড, পোল্যান্ড, ১৯২১ সালে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান।

রাশিয়াতে বলশেভিক সরকার ১৯১৭ সালে ক্ষমতায় এসেই মেয়েদের ভোটাধিকার দিয়েছে। ১৯১৮সালে ত্রিশোর্দ্ধ ইংরেজ মহিলা ভোট দেবার অধিকার পেল কিন্তু তখন ছেলেদের ভোট দেবার ন্যূনতম বয়স ছিল ২১। একুশ বছর বয়সে ভোট দেবার জন্য আরো দশ বছর ইংরেজ মেয়েদের অপেক্ষা করতে হলো।

কাছাকাছি সময়েই ইউরোপের অন্যান্য দেশের মেয়েরাও ভোটের অধিকার পেলেন। জার্মানীরা নতুন ওয়াইমার প্রজাতন্ত্র দিলো ১৯১৯ সালে। সুইডেন, নেদারল্যান্ডস আর লুকেসমবার্গ দিল ১৯১৮ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে। পোল্যান্ড ১৯২১ সালে, গ্রীস ১৯২৯ সালে, স্পেনে ১৯৩১ সালে ভোটাধিকার স্বীকৃত হল। আশ্চর্য্যের বিষয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রণী দেশ ফ্রান্সে মহিলারা ভোটাধিকারের সুযোগ পেয়েছেন ১৯৪৪ সালে কমিউনিষ্ট কোয়ালিশন সরকারের সময়কালে।

ভারতে মহিলাদের ভোটের অধিকার কার্যকর হয় ১৯২৯ এ। এই ভোটাধিকারের তিনটি শর্ত যুক্ত ছিল ঃ (১) নারীকে বিবাহিত হতে হবে, (২) তাকে সম্পত্তির অধিকারী হতে হবে এব (৩) তাকে শিক্ষিত হবে হবে।

একটি বিষয় লক্ষণীয়। আঠার শতক থেকে পশ্চিম দেশে যেমন নারী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল আমাদের দেশে নারী মুক্তির প্রচেষ্টাগুলির ক্ষেত্রে তেমনটি দেখা যায় নি। কোন কোন ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় বা কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নারীকে আরো সক্ষম করার কর্মসূচি হাতে নিলেও এই প্রচেষ্টার জন্য ছিল নারীকে সুগৃহিনী করে তোলা যাতে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে সে তার স্বামীর প্রকৃত কর্মসঙ্গিনী হতে পারে।

বিংশ শতকের গোড়া থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে নারী পুরুষ সমবেতভাবে কাজ করেছেন। সেখানে লক্ষ্য ছিল দেশকে স্বাধীন করা। অবশ্য পরোক্ষভাবে নারীর শৃঙ্খলও কিছুটা শিথিল হয়েছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচির সংযোজন হিসেবে হয়ত কখনো নারীর সমস্যার কথা উত্থাপিত হয়েছিল অথবা সমাজে একটা আর্থ সামাজিক পরিবর্তনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে নারী কিছু সুযোগ পেয়েছিল। ভারতের নারীকে যখন পাশাপাশি দুটো চাপের বিরুদ্ধে যুঝতে হয়েছে – একদিকে ঔপনিবেশিকতার চাপ, আর অপর দিকে লিঙ্গ

বৈষম্যের চাপ –তখন দেখা গেছে সবসময় প্রথম চাপের মোকাবিলাটা বেশি জরুরি মনে করা হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে যে নারী আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল তা পৃথিবীর বিভিন্ন কোণে ছড়িয়ে গেলেও সব জায়গায় সমান ফলপ্রসূ হয়নি। এক একটি আন্দোলনে কিছুটা ওঠা পড়াও চলতে থাকে। নানান চাপে আন্দোলন কখনও স্থগিত থেকেছে, কখনো পিছু হটেছে। আবার কখনও পরিত্যক্ত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই মূল বিষয়ের সঙ্গে প্রাথমিক এবং অপ্রাসঙ্গিক সমস্যা জড়িয়ে গিয়ে সংগ্রামের লক্ষ্য ঝাপসা হতে থাকে। ফলে আন্দোলনে ক্রমশ ভাঙ্গন ধরে।

সীমিতভাবে হলেও, একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আন্তর্জাতিক স্তরে নারীর অধিকারের প্রশ্নটি গুরুত্ব পেতে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। বিশ্বসংস্থা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে নারীর ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা ঘোষিত হয়েছে বারংবার। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের চতুর্থ অধিবেশনে গৃহীত সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণায় (১৯৪৮) এই ধারণাকে আরও বিস্তৃত ও সুনির্দিষ্ট করা হয়। এর ক্রমধারায় গৃহীত হয়েছে নিম্নোক্ত দলিল। যাতে নারীর অধিকার বর্ণিত হয়েছে আরও সুনির্দিষ্ট ও বিশদভাবে ঃ

১। ১৯৪৯ সালে গৃহীত নারী পাচার ও পতিতাবৃত্তি নিরোধ সংক্রান্ত কনভেনশন।

২। ১৯৫২ সালে গৃহীত মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন।

৩। ১৯৫৬ সালে গৃহীত দাসত্বের বিলোপ সংক্রান্ত সম্পূরক কনভেনশন।

৪। ১৯৫৭ সালে গৃহীত বিবাহিত মহিলাদের জাতীয়তা সংক্রান্ত কনভেনশন।

৫। ১৯৬২ সালে গৃহীত মহিলাদের প্রতি বৈষম্য বিলোপের ঘোষণাপত্র।

সাম্প্রতিককালে মানবাধিকার ও উন্নয়ন সম্পর্কিত আলোচনায় নারীদের বিষয়টি বেশ গুরুত্ব পেয়েছে। নারীদেরকে উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে যিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন তিনি হলেন ডেনমার্কের অর্থনীতিবিদ এস্টার বসরাপ (Ester Boserup)। ১৯৭০ সনে তাঁর **উইম্যান'স রোল ইন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (Woman's Role in Economic Development)** শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর এ ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী সচেতনতার সৃষ্টি হয় যার ফলে নারী সম্পর্কিত বিচার্য বিষয়টি আন্তর্জাতিক আলোচ্যসূচিতে স্থান লাভ করে। এর মধ্যে সবচেয়ে অর্থবহ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে নারীদের প্রতি যে অসদাচরণ করা হয় তাকে আন্তর্জাতিক সমস্যা বলে চিহ্নিত করে তাদের প্রাপ্য অধিকারকে স্বীকৃতিদানের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানো।

এ সবেরই ক্রমধারায় ১৯৭৫ সালকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ হিসেবে এবং ১৯৭৫–১৯৮৫ এই দশ বছরকে নারী দশক হিসাবে ঘোষণা করে।এই সময়কালের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯৭৫ সালে অনুষ্ঠিত মেক্সিকো বিশ্ব নারী সম্মেলন। মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্বনারী সম্মেলনে 'সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি'– এই স্লোগান ঘোষিত হয়। এই সম্মেলনে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি 'বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা' (The World Plan Action) গৃহীত হয়। মেক্সিকো ঘোষণার প্রারম্ভে স্বীকার করা হয় যে বিশ্বব্যাপী নারীরা নির্যাতিত। এটি নির্যাতনকে অসমতা এবং অনুন্নয়নের সমস্যার সাথে সম্পর্কিত করে এবং নারীদেরকে যে কোনো ধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানায়। মেক্সিকো সম্মেলনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যার প্রধান কয়েকটি হলো ঃ

- আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের (১৯৭৫) উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব পরিকল্পনা অনুমোদন করা।
- ১৯৭৬–৮৫ সময়কে জাতিসংঘের নারীদশক ঘোষণা করা।
- নারীদশকের জন্য সেবামূলক তহবিল প্রতিষ্ঠা করা।
- নারী বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যু আলোচনা ও গবেষণা করার জন্য একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করা – যার নাম হয় United Nations International Research and Training Institutions for the Advancement of Women (INSTRAW)।

১৯৭৯ সালের ১৮ ই ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক সনদ বা CEDAW (সিডঅ)। বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপ, নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন এবং সাধারণ পরিষদের মধ্যে পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা ও পর্যালোচনার সফল পরিণতি ছিল এই সনদ।

জাতিসংঘের বিভিন্ন দলিলে 'মহিলাদের প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ-সংক্রান্ত কনভেনশন'কে অভিহিত করা হয়েছে নারী-অধিকার অর্জনের পথে একটি মাইলফলক হিসেবে। বর্তমান সমাজে পুরুষ-নারীভিত্তিক যত বৈষম্য প্রচলিত রয়েছে, 'সিডঅ' তার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এর অবসানের পথনির্দেশিকা দিয়েছে।

'মহিলাদের প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপসাধন-সংক্রান্ত কনভেনশন'-এ বর্ণিত নারী অধিকার-সংক্রান্ত নীতিমালার সারসংক্ষেপ হল ঃ

মহিলাদের প্রতি যে - কোনোরূপে যে- কোনো ধরনের বৈষম্য নির্মূল করা, মহিলাদের মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের সমান অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান, নাগরিক ও রাজনৈতিক জীবনে মহিলাদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, সামাজিক জীবনে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ, জাতীয়তা পরিবর্তন ও গ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতি বৈষম্য নিরোধ, বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ, চাকরির ক্ষেত্রে মহিলাদের সুযোগ বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতি বৈষম্য নির্মূল ও গ্রামীণ মহিলাদের সমস্যা দূরীকরণের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ, আইনগতভাবে মহিলাদের সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ, বিবাহসহ পারিবারিক জীবনে মহিলাদের সমান অধিকার প্রদান।

প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত বিশ্বকর্ম পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে 1980 সালে কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কোপেনহেগেন সম্মেলনের মূল প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নারী দশকের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে সকল উন্নয়ন, কর্মসূচী ও প্রকল্পে নারীর স্বার্থ নিশ্চিত করতে হবে।
- উন্নয়নে নারীকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথার্থ প্রশাসন যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- নারীর স্বার্থ রক্ষার জন্য দাতা এবং গ্রহীতা, দেশগুলো যাতে সতর্ক দৃষ্টি রাখে, তা নিশ্চিত করতে হবে।
- জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে অর্থসাহায্য বৃদ্ধি এবং অন্যান্য ইনপুট দিয়ে দিয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সমতা আনতে হবে।
- তথ্য, শিক্ষা এবং আত্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় উপায় যোগানের মাধ্যমে পরিবারকে আয়তন নির্ধারণ করার অধিকার দিতে হবে।
- নারীর বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নারীদশকের শেষ প্রান্তে তৃতীয় নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নাইরোবিতে (১৯৮৫)। এই সম্মেলনে ২০০০ সাল নাগাদ নারী উন্নয়নের জন্য নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশলসমূহ গৃহীত হয়। এতে লিঙ্গীয় সমতা, নারীর ক্ষমতা, মজুরি বিহীন কাজের স্বীকৃতি, মজুরিযুক্ত কাজের অগ্রগতি, নারীর জন্য স্বাস্থসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা, উন্নত শিক্ষার সুযোগ

এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়। এই সম্মেলনে বিশেষ বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ১৪টি অবহেলিত গ্রুপ চিহ্নিত করা হয়েছিল যেমন – (১) খরায় আক্রান্ত নারী, (২) শহরের দরিদ্র নারী, (৩) বৃদ্ধ নারী, (৪) যুবতী নারী, (৫) অপমানিত (Abused) নারী, (৬) দুঃস্থ নারী, (৭) পাচার এবং অনিচ্ছাকৃত পতিতাবৃত্তির শিকার নারী, (৮) জীবিকা অর্জনের সনাতন উপায় থেকে বঞ্চিত নারী, (৯) পরিবারের একক উপার্জনশীল নারী, (১০) শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম নারী, (১১) বিনা বিচারে আটক নারী, (১২) শরণার্থী এবং স্থানচ্যুত নারী ও শিশু, (১৩) অভিবাসী নারী এবং (১৪) সংখ্যালঘু ও আদিবাসী নারী।

নারীর অগ্রগতির পথে বাধাসমূহ দূর করার সুস্পষ্ট পক্ষযোগের কথা নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশলে বর্ণিত আছে যার সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছিল ১৯৮৬–২০০০ সাল পর্যন্ত।

নারী-অধিকার নিয়ে আলোচনা ও অধিকার বাস্তবায়ন পর্যালোচনাকে ভিত্তি করে এযাবৎ অনুষ্ঠিত বিশ্ব ফোরামের মধ্যে বেজিং-এ অনুষ্ঠিত (সেপ্টেম্বর ১৯৯৫) চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন (Fourth World Conference of Women) সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বিশ্বের প্রায় ২০০ দেশের প্রায় ৩০ হাজার প্রতিনিধি অংশ নেন এ সম্মেলনে। মোট ৩৬২ টি আলোচ্যসূচির ওপর গ্রহণ করা হয় পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত।

বেজিং বিশ্ব-নারী সম্মেলনে বর্তমান বিশ্বে নারীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে শনাক্তকৃত 'উদ্বেগের আশঙ্কাজনক ক্ষেত্রসমূহ' (Critical areas of concern) নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। এই পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিতে আগামী শতাব্দীর নারীর অগ্রগতির জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে করণীয় সমূহও নির্ধারণ করা হয়।

বেজিং চতুর্থ নারী সম্মেলনের মুখ্য বিবেচ্য বিষয় ছিল তিনটি। এগুলি হচ্ছে ঃ

- বর্তমান সময়ে নারী-অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রধান ১২ টি প্রতিবন্ধকতা বা সংকটের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ।
- এর প্রতিকারে কৌশলগত লক্ষ্য নির্ধারণ।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশমালা প্রণয়ন।

উদ্বেগের আশঙ্কাজনক ক্ষেত্র হিসেবে যে ১২টি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলিকে ঘিরেই আবর্তিত বর্তমান বিশ্বের নারীজীবনের সংকট। এই ক্ষেত্রগুলি হচ্ছে ঃ

১. দারিদ্র্য, ২. শিক্ষা, ৩. স্বাস্থ্য, ৪. সন্ত্রাস/ নির্যাতন, ৫. যুদ্ধ ও অন্যান্য সংঘর্ষ, ৬. অর্থনৈতিক বৈষম্য, ৭. ক্ষমতা বন্টন, ৮. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, ৯. মানবাধিকার, ১০. গণমাধ্যম, ১১. পরিবেশ ও উন্নয়ন এবং ১২. কন্যা-শিশু।

এই ১২টি ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে নারীর অধিকার বাস্তবায়নের জন্য যে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, তাকে সংক্ষেপে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায় ঃ

- ২০০০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে এমন জনসংখ্যা ৫০ শতাংশ হ্রাস করতে হবে – এ লক্ষ্যে নারীদের জন্য উন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলে তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করতে হবে;
- দরিদ্র নারীদের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
- সম্পত্তির আইনগত মালিকানা, ঋণ গ্রহণ ও অন্যান্য সেবার ব্যাপারে নারীকে সমান সুযোগ দিতে হবে;
- শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য রদ করতে হবে;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রবেশে বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে;
- পাঠক্রম ও পাঠগ্রন্থ থেকে নারীবিদ্বেষী উপাদান বাদ দিতে হবে;
- শিশুমৃত্যু ও গর্ভধারণ-সম্পর্কিত মৃত্যু অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে;
- প্রজনন-সম্পর্কিত স্বাস্থ্যব্যবস্থা উন্নত করতে হবে;
- মহিলাদের মধ্যে এইডস ও এইচ.আই.ভি. সংক্রমণ রোধে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে;
- নারী-নির্যাতনের মূল উৎস সন্ধান (ব্যাপক গবেষণাসহ) করতে হবে ব্যাপকতর ভিত্তিতে এবং নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নের মাধ্যমে এর মূল উৎপাটন করতে হবে;
- নারী-নির্যাতন বন্ধে আইনগত ও সামাজিক ব্যবস্থার সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে;
- নারী-পাচার বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে;
- সমান কাজের জন্য নারী-পুরুষের সমান মজুরির ব্যবস্থা করতে হবে;
- কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি যে- কোনো অপমানজনক আচরণ রোধ করতে হবে;
- নারীদের জন্য ঋণদানের বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ এবং তাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- নারীদেরকে প্রযুক্তি, বাজার ও বাণিজ্যে সমান সুযোগ দিতে হবে;
- নারীদের জন্য খণ্ডকালীন কাজের ব্যবস্থা করতে হবে;
- তথ্য গণমাধ্যম ক্ষেত্রে নারীরা যাতে প্রবেশের সমান সুযোগ ও অধিকার পায়, তা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে;

- গণমাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত নারীর সংকীর্ণ image দূর করতে হবে;
- টেকসই উন্নয়ন ও বজায় রাখার মতো ভোগের ক্ষেত্রে নারীর অবদানকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

এসব দিক বিবেচনা করে বলা যায় যে, রাষ্ট্রসংঘ নারী সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী ভূমিকা পালন করে আসছে। এ সংস্থাটি নিজেই কেবল এ ভূমিকা পালন করছে না বরং জাতীয় সরকার সমূহ ও অন্যান্য সংস্থাগুলিকে নারী উন্নয়নের কাজগুলি করতে নানাভাবে সহায়তা করছে।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যা ১২১ কোটি এবং এর মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ৫৮ কোটি ৬৫ লক্ষ জন। মহিলাদের এই বৃহৎ অংশ থাকা সত্ত্বেও ভারতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলারা অবহেলিত এবং তাদের উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় না। নারী সমাজ কীভাবে এবং কী পরিমাণে অন্যায় অবিচারের শিকার হয়েছে, তার কিছু কথা রাখতে চাইছি। LANCET-এর সমীক্ষা অনুসারে শুধু ১৯৮০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত তিন দশকে ভারতে ১ কোটির মতো কন্যা-শিশুকে ভ্রূণ অবস্থায় বিনষ্ট করা হয়েছে। ভারতের জনগণনার তথ্য নিচে উল্লেখ করা হলো – এক হাজার পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা এবং ৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত এক হাজার পুত্র-শিশু পিছু কন্যা-শিশুর সংখ্যা দেখানো হলো ঃ

	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
হাজার পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা	৯৪১	৯৩০	৯৩৪	৯২৭	৯৩৩	৯৪০
হাজার পুত্র-শিশু পিছু কন্যা-শিশুর সংখ্যা	৯৬০	৯৬৪	৯৬২	৯৪৫	৯৩৩	৯১৪

সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে শিক্ষিত এবং সম্পদশালী পরিবারে কন্যা-শিশুকে গর্ভাবস্থায় বিনষ্ট করার ঝোঁক বেশি – যদিও সরকারী আইনে আছে গর্ভাবস্থায় সন্তানের লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষা করা নিষিদ্ধ।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে বিশ্বে গড়ে দিন-রাত মিলিয়ে ২৪ ঘন্টায় একজন পুরুষ কাজ করে ৪০৩ মিনিট, একজন নারী কাজ করে ৪২৩, ভারতে একজন পুরুষ গড়ে কাজ করে ঐ সময় ৩৯১ মিনিট। আর একজন নারী কাজ করে ৪৫৭ মিনিট। ভারতে

আইনে আছে ১৮ বৎসর বয়সের নিচে কোনো বালিকাকে বিবাহ দেওয়া যাবে না। সম্প্রতি ভারতব্যাপী এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে প্রতি বৎসর যত মহিলার বিবাহ হয় তার ৪৮ শতাংশের বয়স ১৮ বৎসরের নিচে। আর প্রতি বছর যত নারী গর্ভবতী হয় তার ৪৫ শতাংশই ঐ কম বয়সে বিবাহিত রমণীদের।

বিশ্বের আর কোথাও নেই, আছে ভারতে – অন্য সম্প্রদায়ের কোনো যুবকের সাথে যদি কোনো যুবতী সখ্যতা বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে পরিবারের লোকজন ঐ যুবতীকে পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে খুন করে (Honour Killing)।

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের অধীন 'ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো' নামের একটি সংস্থা আছে। সারা দেশের নথিভুক্ত অপরাধের তথ্যাবলী তারা প্রতি বছর 'ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া'– শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ২০১১ সালে প্রকাশিত ঐ রিপোর্টে উল্লেখ আছে ২০০৯ সালে ভারতে নারী ধর্ষণ হয়েছে ২১,৩৯৭, নারী অপহরণ হয়েছে ২৫,৭৪১। পণ-প্রথার শিকার হয়ে মৃত্যু হয়েছে এমন নারীর সংখ্যা ৮,৩৮৩, বধূ-নির্যাতন হয়েছে ৮৯,৫৪৬, যৌন নিগ্রহ হয়েছে ১১,০০৯, নারী পাচার হয়েছে ২,৪৭৪ গড়ে প্রতিদিন ১২৫ জন নারী আত্মহত্যা করেছে।

সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ব্যবধান বা বৈষম্যের মাত্রা বিবেচানা করে 'ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম' প্রতি বছর বিশ্বের দেশগুলির তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্ব জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স (Global Gender Gap Index) প্রাকশ করে। ২০১০ সালের ঐ প্রতিবেদনের সূচকে বিশ্বের ১৩৪ টি দেশের তথ্যাবলী উদ্ধৃত করে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যের ব্যাপকতা প্রকাশ করেছে। ঐ সূচকে ভারত আছে ১১২ তম স্থানে – অর্থাৎ দেশে নারী-পুরুষের মধ্যে কার বৈষম্যের বিচারে ভারত থেকে সম্মানজনক দেশের সংখ্যা ১১১ টি – আর ভারত থেকে ঐ বিচারে নিকৃষ্ট দেশের সংখ্যা মাত্র ২২ টি।

এরপরে থমসন রয়টার্স উইমেন গত জুন মাসে বিশ্বের দেশগুলির কোন্ দেশে নারীসমাজ কতখানি বিপন্ন তার একটি পরিসংখ্যান দিয়েছে। বিশ্বের ৪ টি দেশের নারীসমান সব থেকে বেশি বিপন্ন – সেই ৪টি ধিকৃত তিরস্কৃত দেশের মধ্যে প্রথম আফগানিস্তান, দ্বিতীয় কঙ্গো, তৃতীয় পাকিস্তান, চতুর্থ ভারত।

অথচ ভারতীয় সংবিধানে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে নারীদের প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে ঃ

১৪নং ধারায় বলা হয়েছে, রাষ্ট্র ভারত ভূ-খণ্ডে কোন ব্যক্তির আইনের চোখে সমতা বা আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার অস্বীকার করতে পারবে না।

১৫(১) ধারা অনুসারে রাষ্ট্র কেবল ধর্ম, বর্ণ, জাতি, স্ত্রী, পুরুষ, জন্মস্থান ভেদে বা তাদের কোন একটি কারণে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না।

১৬(১) ধারা অনুসারে চাকরির ক্ষেত্রে ভারতের সমস্ত নাগরিক সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে।

১৯(১) ধারা অনুসারে নাগরিকদের (স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে) যে কোন বৃত্তি, পেশা বা যে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য অবলম্বনের অধিকার আছে।

২৩(১) ধারা অনুসারে মানুষ নিয়ে ব্যবসা, বেগার খাটানো বা বলপূর্বক পরিশ্রম করানো আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ।

৩২ ধারায় বলা হয়েছে যে কারো মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে তার প্রতিবিধানের জন্য হাইকোর্ট বা সুপ্রীমকোর্টে আবেদন জানানো যাবে।

ভারতের নারী জাতির উন্নয়ন ও সমানাধিকারের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার আইন প্রণীত হয়েছে। অবৈধ পাচার সম্পর্কিত আইন (১৯৫৬), পণপ্রথা বিরোধী আইন (Dowry Bohibition Act, ১৯৬১) মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন (Maternity Act, ১৯৬১), সমহারে বেতন আইন, (১৯৭৮), পণজনিত কারণে বধূহত্যা (১৯৮৩), পারিবারিক আদালত আইন (Family Courts Act, ১৯৮৪), ভ্রূণহত্যা সম্পর্কিত আইন (১৯৯৪)। এছাড়া সর্বোচ্চ আদালত বিশাখা বনাম স্টেট অব রাজস্থান মামলায় কর্মস্থানে মহিলাদের প্রতি নির্যাতন বন্ধে যে নির্দেশিকা (১৯৯৭) প্রণয়ন করেছে, সেটিও সংবিধানের ১৪১ ধারায় আইন হিসেবেই গণ্য করা হয়। সাম্প্রতিককালে মহিলাদের সুরক্ষার জন্য প্রণীত আইন – ২০০৫ সালের Protection of Women from Domestic Violence Act-এ নির্যাতনকে ব্যাপক অর্থে মৌখিক, শারীরিক, যৌন আবেগপ্রবণ এবং অর্থনৈতিক (নির্যাতন), অপব্যবহার অথবা এই ধরনের ভীতি প্রদর্শন হিসেবে ব্যাখ্যা করে এই অনিয়মের প্রতিকারের কিছুটা চেষ্টা করা হয়েছে।

এছাড়া বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতীয় মহিলাদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারকে সুনিশ্চিত করার জন্য ১৯৯০ সালে জাতীয় মহিলা কমিশন গঠন করা হয়। নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯৭–২০০২) মহিলাদের সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে মোট আর্থিক বরাদ্দের ৩০ শতাংশ মহিলা সংক্রান্ত প্রকল্প ও কর্মসূচীতে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত হয়। মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা, বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকল্পে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। নারী স্বাধিকার বর্ষে (২০০১) নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকাশিত নীতি ঘোষিত হয়। নীতিগুলি মূলত মহিলাদের পূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে উপযুক্ত ও অনুকূল পরিবেশ গঠন, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ, জাতীয় জীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সমান অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্য পরিবেশ, উন্নত শিক্ষা, কর্মসংস্থান,

সামাজিক নিরাপত্তা, সরকারী পদে সমানাধিকার, পেশাগত নিরাপত্তা ও সমহারে বেতন সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়।

নাইরোবি পরবর্তী সময়ে বিশ্বজুড়েই বিভিন্ন দেশে মেয়েদের রাজনৈতিক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের দাবী ক্রমশ সোচ্চার হয়ে ওঠে। আমাদের দেশেও জাতীয় স্তরে বিভিন্ন মহিলা সংগঠন নির্বাচিত রাজনৈতিক সংস্থায়, মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করতে সংরক্ষণের আওয়াজ তোলে। ১৯৯৩ সালে ভারতীয় সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪ তম সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশে।

কিন্তু ভারতীয় সংবিধান উল্লিখিত বিভিন্ন ধারা এবং আইনসভা কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন আইন সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজে মহিলাদের অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয় নি। বস্তুত আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাতে আমরা দেখি যে প্রগতিশীল আইনও অনেক সময়ে মেয়েদের কাজে লাগে না। এর কারণ শুধু এই নয় যে আইনের গতিশ্লথ ও দীর্ঘমেয়াদী, তাছাড়াও সমাজ শরীরের মধ্যে যে পিছুটান থাকে তা আইনের ধারাতেই শুধু নয় বিচারপদ্ধতির মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। এইসব এইসব পিছুটান কেবল লিঙ্গ ঘটিত নয়, শ্রেণী ঘটিতও বটে। আমাদের দেশে ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের ঘটনায় উৎপীড়িত নারীদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ শ্রমজীবী, দলিত ও আদিবাসী। এইসব ঘটনা অনেক সময় পুলিশ পর্যাপ্ত পৌঁছায় না। প্রাথমিক তদন্তের পর চার্জসিট তৈরি হয়ে বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হবার আগেই অনেক ঘটনা হারিয়ে যায়, যদি বা বিচার হয় বেকসুর খালাসের সংখ্যা এত বেশি যে আইনের ফাঁকফোকরগুলি বড় প্রকট হয়ে পড়ে। আশির দশকের গোড়ায় মথুরা ধর্ষণ মামলায় উচ্চতম আদালত থেকে অভিযুক্ত পুলিশরা বেকসুর খালাস পায়। কেননা আদিবাসী মেয়ে মথুরা তাঁর অসম্মতি জানানোর জন্য আক্রমণকারীদের যথাসাধ্য প্রতিরোধ করেছিল কি না তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ফলে যৌনসংসর্গ তাঁর অনিচ্ছায় ঘটেছিল, এমন কোন প্রমাণ না থাকায় আদালতের চোখে ধর্ষণ প্রমাণিত হয়নি। এই রায়ের প্রতিবাদে সারা দেশের নারী আন্দোলন থেকে তীব্র ধিক্কার ওঠেতার ফলেই ধর্ষণ সংক্রান্ত আইন কিছুটা পালটেছিল।

বিগত তিন দশকে নারী আন্দোলনের চাপে আইন ও বিচার পদ্ধতির কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ (খ) ধারা অনুযায়ী বিয়ের সাত বছরের মধ্যে কোনো মেয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে তার স্বামীর পরিবারের বিরুদ্ধে আগে থেকে পণের জন্য অত্যাচারের অভিযোগ থাকলেই সেই মৃত্যুকে পণজনিত মৃত্যু বলে ধরে নেওয়া হবে। ৪৯৮ (ক) ধারায় কোনো মহিলা তারা স্বামী বা কোনো আত্মীয়ের বিরুদ্ধে শারীরিক বা মানসিক অত্যাচারের অভিযোগ করলে তার ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে নির্দেশ দেওয়া

হচ্ছে। এই দুটি আইনই পরিস্থিতি একটা চরম অবস্থায় পৌঁছানোর পর প্রশাসনের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন সূচিত করে। অর্থাৎ পণ দেওয়া নেওয়া একটা পারিবারিক / সামাজিক ব্যাপারই থেকে যাচ্ছে, একমাত্র মেয়েটির অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে তবেই পণের জেরে তা হল কিনা তা দেখার দায় প্রশাসনের ওপর বর্তাচ্ছে। ৪৯৮ (ক) ধারাটিও একটা চূড়ান্ত অবস্থাকেই ধার নেয়, মেয়েটি যখন অভিযোগ করতে আসে তখন থানার আধিকারিকরা বারবার এটাই যাচাই করার চেষ্টা করেন যে সে অবস্থা এসেছে কিনা। কারণ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা মানেই পরিবারের একান্তে প্রশাসনের অনুপ্রবেশ। একবার তা করলে মেয়েটির আশ্রয়ের প্রশ্নও এসে যায়। সে দায় প্রশাসনও নিতে চায় না, তার সাধ্যও নেই। সমস্যার মূলে গিয়ে পৌঁছতে পারছে না বলেই এবং পরিবারের মধ্যে মেয়েদের অবমূল্যায়ণকে একটা ধ্রুবসত্য বলে মেনে নিতে হচ্ছে বলেই এই আইনগুলির প্রয়োগও খুবই সীমিত।

আমাদের পারিবারিক আইনগুলির মধ্যে একজন নারীকে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে, তা তিনি একজন ব্যক্তি এই ধারণার ভিত্তিতে নয়, পরিবারের প্রধানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ভিত্তিতে। অর্থাৎ তিনি কারুর মা, কারুর স্ত্রী, কারুর কন্যা এই হিসেবেই পারিবারিক কতকগুলি অধিকার তিনি পেয়ে থাকেন। আইনের যে ধারাগুলির কথা বলা হল, তাই এই মূল চিন্তাটিকে অক্ষুন্ন রেখে ঐ কাঠামোর মধ্যেই অত্যাচারের বাড়াবাড়িকে একটা সীমানায় বেঁধে দিতে চায়। সুতরাং সঠিকভাবেই বলা যায় যে, সমাজের একপেশেমির প্রতিফলন ঘটে এই আইনগুলিতে। নারীর অস্মিতা (Subjectivity) আইনের মধ্যে তখনই রূপ নিতে পারে, যখন তা পরিবারে বা সমাজে স্বীকৃত সত্য। যখন শুধু সে মাতা, স্ত্রী বা কন্যা হিসাবে চিহ্নিত হবে না, পরিবারের অন্যদের সে তার পিতা, স্বামী বা পুত্র বলে পরিচয় দিতে পারবে, কেবল তখনই পরিবারের বৃত্তে তার অস্মিতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ–

১। ডঃ চিত্ত মন্ডল, নারী নির্যাতন নারী আন্দোলন, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৬।

২। শ্যামলী গুপ্ত ও অনুশীলা দাশগুপ্ত – রাজনীতি ও সাহিত্য শিল্পের অঙ্গনে নারী, এন.ই. পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৭।

৩। শেফালী মৈত্র, নৈতিকতা ও নারীবাদ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট মিলিটেড, কলকাতা, ২০০৩।

৪। শ্যামলী গুপ্ত, নারী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৭।

৫। তোফাজ্জল হোসেন, জাতিসংঘ, আগামী প্রকাশনী, ২০০৭, ঢাকা।

৬। কান্তি বিশ্বাস, বিশ্ব প্রেক্ষাপটে ভারতের নারীসমাজ ঃ অতীত ও বর্তমান, দেশহিতৈষী, শারদ সংখ্যা, ২০১১।